শহীদ আবু হামযা আশ-শামী রহ. এর গল্প

এক শহীদের কলমে আরেক শহীদ

মূলঃ শহীদ আবুল মুছান্না আল মাদানী রহ.

অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ হিন্দুস্তানী হাফিযাহুল্লাহ

শহীদ আবু হামযা আশ-শামী রহ. এর গল্প

এক শহীদের কলমে আরেক শহীদ

মূলঃ শহীদ আবুল মুছান্না আল মাদানী রহ.

অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ হিন্দুস্তানী হাফিযাহুল্লাহ

উসামা প্রকাশনী

ভূমিকা

একটি ঘটনা। পবিত্র রক্তের ঘটনা। পবিত্র ভূমিতে একটি পবিত্র শাহাদাতের ঘটনা। এ ঘটনায় উঠে এসেছে বিলাদুশ শামের এক শহীদের কথা। তার জন্মের পূর্বের, পরের, পবিত্র শৈশবের, অমলিন কৈশোরের; এরপর শাহাদাতের তামান্নায় টইটম্বুর যৌবনের কথা। সবশেষে বিস্ময়কর শাহাদাতের কথা। লিখেছেন আরেক শহীদ। বিলাদুশ শামের আরেক মহান শহীদ। কী আশ্চর্য! কী অপূর্ব মিতালী। শাহাদাতের ক্বলব আর শাহাদাতের কলমের এক অপরূপ বন্ধন। ঘটনার নায়ক আবু হামযা আশ-শামী। ঘটনার লেখক আবুল মুছান্না আল মাদানী। এই পবিত্র ঘটনার ভূমিকা লিখছি আমি এক অধম। শহীদ শামীর জীবনী নিয়ে লেখা শহীদ মাদানীর এই রচনায় ভূমিকা লেখার দুঃসাহস আমার কিছুতেই ছিল না। তবে একটি আগ্রহ আমায় সাহস যুগিয়েছে। আমি চাই এই মহান লেখকের পরিচয় তুলে ধরে ভূমিকা লেখার পথ ধরে আমিও মিলিত হবো এই শহীদী কাফেলার সাথে। জান্নাতের সজীব বাগিচায়। সবুজ পাখিদের মিলন মেলায়।

আবুল মুছান্না আল মাদানী "তাওয়াক" নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বড় পরিচয়, তিনি হারামাইন শরীফাইনের মেহমান। কুরআনের হাফেজ। তালিবুল ইলম। দ্বীনের নুসরাতে হিজরত করেছেন শামের ভূমিতে। আল্লাহর দ্বীনের সাচ্চা খাদেমদের একজন। শৈশব থেকেই উচ্চ মনোবলের অধিকারী। যৌবনের সূচনা থেকেই জীবনকে রেখেছেন কর্মচঞ্চল। ইলমের পথে, দাওয়াতের পথে তার রয়েছে বিস্তৃত অবদান। মুসলিম মেয়েদের মাঝে পর্দার গুরুত্ব জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি একটি কমিটি খোলেন। নাম ইবনাতুল ইসলাম। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল ইসলামে পর্দার গুরুত্ব প্রচার করা। মহিলাদের মাঝে এর প্রতি উৎসাহবোধ জাগিয়ে তোলা। আলহামদু লিল্লাহ! এই প্রচারণার বদৌলতে শামের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্দার ব্যবহার ব্যাপক হয়েছে।

"হালাকাতু তাহফিজিল কোরআন" নামে তাঁর আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছিল। মুসলিম শিশুদের মাঝে হিফজুল কোরআনের আগ্রহ জাগিয়ে তোলাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। শামের ভূমিতে এমন প্রতিষ্ঠান খুবই বিরল। গত রমজানের কথা, মাসের শেষদিকে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি হিফজুল কোরআন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ১০০০ শিশু অংশগ্রহণ করে। এদের মাঝে অর্ধেকই তাঁর সরাসরি ছাত্র। প্রতিযোগীতা শেষে তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন। এতে তিনি সিরিয়ান মুদ্রায় দুই মিলিয়ন লিরা খরচ করেন। যা প্রায় দশ হাজার ডলারের সমমূল্য।

আবুল মুছান্না রহ.-এর ছাত্ররা অন্য দশটি ছাত্রের মত নয়। বরং হিফজুল কোরআনের পাশাপাশি, তাজবীদ ও কিরাতেও থাকে তাদের অগাধ জ্ঞান। এত অল্প বয়সে হিফজের সাথে সাথে তাজবীদ ও কিরাতে পান্ডিত্য গড়ে তোলা আবুল মুছান্নার দ্বারাই সম্ভব। আল্লাহর কসম! কোরআনের খেদমতে আমি তাকে যতটা পরিশ্রম করতে দেখেছি এতে তার ইখলাস ও নিষ্ঠাই আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। আমি সবসময় আকাঙ্খা করে বলতাম, হায়! তার জীবনটা যদি আমার হত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীসটি আমি তার মাঝে জীবন্ত পেয়েছি خيركم من تعلم القرآن وعلمه তোমাদের মাঝে যে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এবার তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও শিষ্টাচার নিয়ে কিছু বলি। সমুন্নত চরিত্র মাধুরী, সর্বদা হাস্যোজ্জল চেহারা, মিষ্টিভাষী, মিশুক প্রকৃতি তবে গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তা, বিমুগ্ধকারী আচরণ, শত্রুর মাঝেও প্রভাব বিস্তারকারী চালচলন। চলাফেরায় সাদামাটা তবে আভিজাত্যের ছাপ সবখানে। কুফুর ও আহলে কুফুরের প্রতি গোস্বায় পরিপূর্ণ তার অন্তর। ঈমান ও আহলে ঈমানের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ তার মন। তাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। দ্বীনি কাজে সদা ব্যস্ত জীবনের অধিকারী এক মহান ব্যক্তি। বিশ্রাম ও অবসরতা বলতে কিছু দেখিনি তার জীবনে। কখনো দেখা যায় তিনি ভাষণ দিচ্ছেন, কখনো দরস দিচ্ছেন। কখনো আছেন ওয়াজের মজলিসে, কখনো ব্যস্ত আছেন তাহফিজুল কোরআনের কাজে। এক সময় আছেন যুবকদের তারবিয়তি ক্যাম্পে,

এরপর চলে যাচ্ছেন 'ইবনাতুল ইসলামে'র মিটিংয়ে। এতসব ব্যস্ততা, ক্লান্তি ও পরিশ্রমের মাঝেও মিষ্টি হাসিতে সদা দীপ্তিময় তার উজ্জল চেহারা। এসব সত্ত্বেও তিনি কখনোই ভুলে যেতেন না তার দ্বীনী ভাইদের কথা। তাদের খোঁজ খবর ও সহযোগীতার কথা। বরং মুজাহিদ ভাইদের সাক্ষাতের ব্যাপারে তিনি থাকতেন সদা জাগ্রত। তাদের সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় তিনি থাকতেন তাদের পাশে। মেহমানদারী ও নতুন কারো সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের বেলায় তার তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাতের মূহুর্তটি আমার আজো মনে পড়ে। অকৃত্রিম হাসি, নিষ্ঠাপূর্ণ মুসাফাহা, আবেগ উদ্বেলিত মুয়ানাকা। সব কিছুতেই ছিল ভাব ও আবেগের ছোঁয়া। ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবেশ। এরপর থেকে যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হত জীবনের সেই মুহুর্তটি বড় প্রাণবন্ত ও প্রাপ্তিতে ভরপুর মনে হত। তার সাথে সর্বশেষ আমার সাক্ষাত হয় তার শাহাদাতের চারদিন পূর্বে। সেই সাক্ষাতে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। ইলমের কথা, ইখলাসের কথা, দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগ আর বিসর্জনের কথা। আমি সে দিনের কথাও ভুলতে পারি না যেদিন তিনি আমাকে 'বুলুগুল মারাম' কিতাবটি হাদিয়া দিয়েছিলেন।

আমি তার ব্যক্তিত্বের মাঝে পেয়েছি- একজন ভাবোদ্দীপক বক্তা, গতিশীল কলমধারী লেখক। তার লেখার মাঝে রয়েছে অভাবনীয় প্রভাব। প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। হয়তো এর মূল কারণ হল তার সততা। আন্তরিক সচ্ছতা। কারণ তিনিতো শুধু কলম দিয়ে লেখেন না। লেখেন ক্বলব দিয়ে। তার লেখায় কলমের কালি ঝড়ার আগে ক্বলবের আহ্বান ঝড়ে। আমি আগে থেকেই তার কলমের অনেক প্রশংসা শুনেছি। তবে তার কলমের মূল শক্তি তখনই টের পাই যখন তার প্রথম লেখাটি পড়ি। সেদিন আমি মনে মনে বলি- ভবিষ্যতে এই কলম অনেক চমক দেখাবে। সাহেবে কলমকে আল্লাহ তায়ালা অনেক উচু মাকাম দান করবেন। ইলমি জগতে এক সোনালী অধ্যায় রচনা করবে। কিন্ত উপর ওয়ালার ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু। সামনের হৃদয়স্পর্শী ঘটনায় পাঠক খুঁজে পাবেন সেই অন্য কিছুর উত্তর।

এমন গুণবান একজন ব্যক্তি মানুষের ভালবাসায় সিক্ত থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের হৃদয়ের কত গভীরে প্রেথিত ছিল তার ভালবাসা; তা উপলব্ধি করার সাধ্য অধমের হয়নি। শুধু বলবো, আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম তার প্রতি মানুষের ভালবাসার দৃশ্য।

একদিনের ঘটনা। আমি ও আমার বন্ধু একবার এক মসজিদে গেলাম। যেখানে প্রায়ই আবুল মুছান্না নামায পড়তে আসেন। নামাযান্তে একজন বয়োবৃদ্ধ লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসলেন। উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই! তোমরা কি আবুল মুছান্নার বন্ধু? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। এবার বৃদ্ধ লোকটি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আবুল মুছান্নাকে সাহায্য করো। যে তাকে ভালবাসে তাকেও সাহায্য করো। আর যারা তাকে ভালোবাসে না তাদের মাথায় গুলি। বৃদ্ধ লোকটি কথাগুলো এক শ্বাসে বলে শেষ করলেন। আমরা বৃদ্ধের ছেলেমি কান্ড দেখে না হেসে পারলাম না। তবে তার প্রতি মানুষের বুক ভরা ভালবাসার কারণে যথেষ্ট অবাকও হলাম। আমি সেদিনই আবুল মুছান্না ভাইকে এই ঘটনা শুনালাম। রসিকতা করে তাকে বললাম, ভাই! ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায়, আজীবন তোমাকে ভালবাসতে হবে। নইলে যে আমার মাথায় গুলি পড়বে।

শাহাদাতের যে ঘটনাটি আমাদের সামনে রয়েছে তা এই মহান ব্যক্তিত্ব আবুল মুছান্না ভাইয়ের হৃদয়স্পর্শী লেখাগুলোর মধ্য হতে একটি লেখা। এটি বেশ কিছুদিন আগে আমার হাতে আসে। ঘটনার আদ্যোপান্ত পড়ে আমার দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়। আমি তাৎক্ষনাত তা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেই। এরপর একদিন তিনি নিজ হাতে লেখাটি আমাকে দেন। তার শাহাদাতের কিছুক্ষণ আগে। তিনিও জানতেন না, আমাদের কারো কল্পনায়ও ভাসেনি যে, অল্পক্ষণ পরেই তিনিও মিলিত হবেন এই ঘটনার নায়েকের সাথে। একই পথে। জান্নাতের সবুজ বাগিচায়। শহীদদের মিলনায়তনে।

তার শাহাদতের পূর্বেই আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম, ঘটনাটি প্রচার করার। কিন্তু আরশের উপর ফায়সালা হয়েছিল অন্য রকম। ফলে আমার অনিচ্ছায়ই বিলম্ব হতে লাগল। আবুল মুসান্না ভাই শহীদ হলেন। আমরা পেয়ে গেলাম একটি অভিনব শিরোনাম "এক শহীদের কলমে আরেক শহীদ"

শামের আলেপ্পো শহর। এখন শত্রু বেষ্টিত। চতুর্দিক থেকে মুজাহিদরা ছুটে আসছেন শহরটিকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে। চারদিকে গোলা বারুদ আর বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ। সংঘর্ষ তুমুলে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একজন সংবাদ নিয়ে আসলো। শহীদের সংবাদ। সংবাদবাহী এসে যখন বলল, "আবুল মুছান্না ভাই আর নেই" আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। তাহলে আবুল মুছান্না ভাই চলে গেলেন। এত দ্রুত। এত অল্প সময়ে আমরা হারিয়ে ফেললাম তাকে। আমি ভাবতে লাগলাম তার ছোট্ট ছোট্ট ছাত্রগুলোর কথা। তার শাহাদাতের সংবাদ শুনে তাদের কি অবস্থা হবে। তার অনুপুস্থিতিতে তাদেরকে পিতৃ আদরে কে মানুষ করবে। আমি দেখলাম তার পরিবার পরিজন, ভাই-বেরাদর তার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে কাঁদছে। হালাবের রোড-ঘাট আশ-পাশ শোকে মুহ্যমান। মসজিদে মসজিদে লোকেরা ছুটে বেড়াচ্ছে তার খোঁজে।

হ্যাঁ, এখনই প্রকৃত সময় তার লেখাটি প্রচার করার। তার শাহাদাতের দাবী পূরণ করার। আমি ভূমিকাটি লিখে ফেললাম। বুশরায়াত পত্রিকার ভাইদের কাছে তা পাঠিয়ে দিলাম। তা ছেপে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

হে পাঠক! আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। তোমাকে রেখে যাচ্ছি এই মহৎ ঘটনার মহান নায়কদের মাঝে। তুমি এতে অবগাহন কর প্রাণ ভরে। আমি এই ঘটনায় পেয়েছিলাম অনেক কিছু। কল্পনাকে হার মানানো বাস্তব জীবনে অংকিত হওয়া কিছু চিত্র থেকে তুমিও নিতে পারো আঁজলা ভরে। তুমি এই ঘটনায় পাবে, কলম ও কলবের শক্তি। কল্পনা ও বাস্তবতার টানাটানি। নিষ্ঠা ও সততার সুঘ্রাণ। অকৃত্রিমতা ও পবিত্রতার সুবাতাস। আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের বিরল উপমা। কখনো তুমি অনুভব করবে তোমার হৃদয়ের শুভ্র পাতলা পর্দাটায় শীতল পরশ, কখনো বা অন্তরের গভীর থেকে সৃষ্ট হবে একটি কম্পন। শাহাদাতের নেশায় কাপিয়ে তুলবে তোমার দেহ-মন। ঘটনার বাঁকে বাঁকে থমকে দাঁড়াবে তুমি। হঠাৎ দৃষ্টি দিবে আপন জীবনের দিকে। এক এক করে চোখ ফিরিয়ে নিবে জীবনের মোড়ে মোড়ে। তুমি প্রশ্ন ছুড়ে দেবে নিজের প্রতি। আমার জীবনেও কি আছে এমন কোন দৃশ্য? আমিও কি করতে পেরেছি দ্বীনের জন্য এমন কিছু?

ঘটনার শেষে তুমি দেখবে তোমার অজান্তেই ভিজে গেছে চোখের পাতা দু'টি। ক্ষণিকের ব্যবধানে তোমার প্রিয় মানুষটি চলে গেল পর্দার আড়ালে। তোমার সামনে এখন লাল লাল রক্ত মাখা একটি দেহ। বুকের ঠিক মাঝখানটা থেকে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তধারা। একটু আগেই যে তোমাকে কাপিয়েছিল, এখন সে-ই পড়ে আছে নিথর নিস্তব্ধ। তার পবিত্র রুহ নিয়ে গেছে , জান্নাতী রমনীগণ। জান্নাতী রুমালের ভাজে করে।

হে আল্লাহ! শুহাদাদের মাঝে তাকে কুবল করো। আ'লা ইল্লিয়্যীনে তাকে সমাসীন করো। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে তাকে দান করো আম্বিয়া ও সিদ্দিকীনের সাথে, সংশ্রবে ও প্রতিবেশিত্বে। তার প্রতিদানে আমাদেরও শরীক করো। তার প্রস্থানের পর সকল ফেৎনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

আনাস খাত্তাব
বিলাদুশ শাম
জুমু'আহ
২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরী
১ জানুয়ারী ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শামের পবিত্র ভুমি,

প্রতিটি অলি গলিতে জড়িয়ে আছে সহস্র বছরের স্মৃতি চিহ্ন। আম্বিয়া আওলিয়াদের ঘটনাপুঞ্জের নীরব সাক্ষী। শামের একটি প্রশিদ্ধ শহর হালাব নগরী। শামের প্রতিটি নগরীর মত এরও রয়েছে কিছু উজ্জল খ্যাতিমান মনিষীদের একদল। আমাদের ঘটনার নায়ক এ মাটিরই একজন পুণ্যবান সন্তান । হালাবের বর্তমান নাম আলেপ্পো। নগরীর একদিকে পাহাড়ী সারি। সবগুলো পাহাড় সবুজ গাছে ঢাকা। দূর থেকে মনে হয় যেন সবুজ সাগরের ঢেও। এর বিপরীত দিকে বিস্তৃত সমতল ভুমি। সবখানেই সবুজের সমারোহ। পাহাড় থেকে খানিকটা দূরত্বে এসে নগরীর জনবসতি শুরু। শহরের ভবনগুলো ততোটা উঁচু নয়। প্রায় সবগুলোর রংই সাদা। একটা ভবন আরেকটা ভবন থেকে পরিমিত দুরত্বে নির্মিত। পাহাড়ের উপর থেকে দৃষ্টি দিলে মনে হবে সবুজের সাগরে ভেসে বেড়ানো কতগুলো সাদা সাদা নৌকা। শীত প্রধান দেশ হওয়ার কারণে শীতকালে প্রায়ই তুষারপাত হয়। বাকি সময় আবহাওয়া সাভাবিক। আবহাওয়ার আদ্রতা ও শীতলতা অধিবাসীদের সভাব চরিত্রে ও প্রভাব ফেলেছে।

****

হালাব শহরের মাঝামাঝিতে একটি সুন্দর বাড়ী। মালিক থাকেন দোতলায়। একটি মাত্র ফ্ল্যাট। দুজনের ছোট্ট সংসার। গিন্নি ও গৃহকর্তা উভয়েই যথেষ্ট দ্বীনদার। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক বেলা কাজ করে যা আয় হয়, তা দিয়ে বেশ ভালই চলে তাদের সংসার। বাকী সময়টা কাটে কোরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনি বই পুস্তক পাঠে। প্রতিদিন আসরের পর স্বামী-স্ত্রী দুজনই এসে দাঁড়ান দোতলার দক্ষিণ বারান্দায়। পড়ন্ত বিকেলের মৃদু হিমেল হাওয়ায় প্রতিদিন বেশ উপভোগ্যই কাটে সময়টা। প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও আসা হল বারান্দায়। তবে আজ স্ত্রী সাথে নেই। সারাটা দিন ছিল মেঘে ঢাকা, বিষন্ন। আজকের বিকেলটা কেমন যেন মনমরা। সূর্যের লাল থালাটি এখন সবুজ পাহাড়ের একেবারে কাছাকাছি। একটু পরেই মুখ লুকাবে পাহাড়ের কোলে। গৃহকর্তার মনটা আজ বেশ উদাস। কি এক চিন্তায় তিনি আচ্ছন্ন। পেছনের জানালায় লাগানো থাই গ্লাস। কাঁচের জানালায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিলেন । মাথায় দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেলেন কয়েক জায়গায় চুল সাদা হয়ে গেছে। উদাস মনে নিজের সেই কাঙ্খিত স্বপ্নের কথাটা মনে পরে গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সাদা চুলগুলো হাতড়াতে লাগলেন। এতক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। দেখলেন নিজের অজান্তেই চোখের পাতা দুটি ভিজে এসেছে। কয়েক ফোটা অশ্রু বেয়ে পড়েছে গন্ডদেশে। অস্ফুট উচ্চারণে বলতে লাগলেন, জীবনের সেই পবিত্র স্বপ্নটি স্বপ্নই থেকে যাবে? হে দয়াময়! তোমার সাথে কৃত সে অঙ্গীকারটি কি অধরাই রয়ে যাবে?

****

গৃহকর্তা নিয়মিয়তই সীরাতের কিছু অংশ পড়েন। নবী জীবনের ঘটনাবলী প্রতিনিয়তই তাঁকে প্রভাবিত করে। সীরাতের সাজে নিজ জীবন সাজাতে তিনি সদা তৎপর। মক্কী জীবনের ঘটনাবলী পড়ে তিনি অনেক ব্যথিত হন। রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবাদের অসহায়ত্ব তাকে নীরবে কাঁদায়। কুখ্যাত আবু জাহেলের পাশবিক আচরণে তিনি যারপর নাই ক্ষুদ্ধ। মাঝে মাঝে ভাবেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম, তাহলে আবু জাহেলকে কয়েক হাত দেখে নিতাম। একবার সীরাতের এক কিতাবে তিনি আবু জাহেলের এমনই একটি পৈচাশিক আচরণের ঘটনা পড়লেন। রাসূলে আরাবীর সাথে বেয়াদবীর কারণে আবু জাহেলের প্রতি ক্ষোভে জ্বলে উঠলেন। ক্রোধে-গোস্বায় শয়তানটাকে আস্ত পুতে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঘটনার শেষ অংশটুকু পড়ে তিনি শান্ত হলেন। তিনি দেখলেন এক সাহসী যোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। আবু জাহেলকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কাহিনী। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই আর এক চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব। পরবর্তীতে যিনি সাইইয়েদুশ শুহাদা খেতাবে ভূষিত হন। আবু জাহেলের কুকর্মের কথা জানতে পেরে হামযা ছুটে গেলেন, আবু জাহেলের বাড়ীতে। ধনুকের আঘাতে রক্তাক্ত করলেন নরাধমকে। মেরে মেরে প্রতিশোধ নিলেন ভাতিজা মুহাম্মদের পক্ষ হয়ে। হযরত হামযার এই বীরত্বপূর্ণ আচরণ গৃহকর্তাকে খুব নাড়া দেয়। হামজার প্রতি ভালবাসায় বুকটা ভরে উঠে। মনে মনে বলে উঠেন, হে দয়াময় আল্লাহ! তুমি যদি আমকে একটি সন্তান দাও আমি তার নাম রাখব হামযা। এই সুখস্বপ্ন বুকে লালন করেই দিন গুনছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে। দয়াময়ের সাথে কৃত এই অঙ্গিকার পূরণের অধীর আগ্রহে রয়েছে এই মোবারক পরিবারটি। কিন্তু বিবাহের পর অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে দীর্ঘ ১২ টি বছর পার হয়ে গেল। ১২ তম বছরটিও প্রায় শেষের দিকে। এখনো কেন প্রতিক্ষার অবসান হচ্ছে না। সেই সোনালী সময়টি আসছেনা। উভয়ের ক্রোড় আলোকিত করে সেই শিশুটি হাসছে না। তবুও আশাহত হয়নি তারা। সবর আর দোয়া অবলম্বন করে এখনো প্রহর গুনছে প্রতীক্ষিত হামযার আগমনের।

****

১৪১৩ হিজরীর কোন একদিন। আলোকোজ্জল সোনালী সকাল বেলা। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মন-মেযাজ আজ বেশ ফুরফুরে। আজকের দিনটাও কেমন যেন আনন্দঘন মনে হচ্ছে। গিন্নির চেহারার ভাজে ভাজে আনন্দের ছাপ। উভয়ে দস্তরখানে বসে নাস্তা সারছেন। রুটি ছিরতে ছিরতে গৃহকর্তা বললেন, ওগো ! তোমাকে আজ বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছে যে ? হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আজ তোমার জন্য এক সুসংবাদ আছে। ভারী আনন্দের। তার আগে বলো, সুসংবাদ পেয়ে আমাকে কি দেবে? স্বামী মায়াবী চেহারায় অপলক তাকিয়ে থেকে বললেন, সুসংবাদ পেয়ে প্রথমেই মহান আল্লাহর সামনে দুটো সিজদা দেবো, আর তুমি ? তুমি যা চাইবে তাই দেবো। গিন্নি বলতে শুরু করলেন, শোন তাহলে- আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে তুমি হামযার বাবা হতে যাচ্ছ। আর আমি হতে যাচ্ছি হামযার মা। কীভাবে বরণ করবে এ আনন্দ সংবাদ। বুকটা যদি সমুদ্রসম হত তাহলে হয়তো এই আনন্দের ঠাই হতো। কিন্তু ছোট্ট এ বুকে এত বিশাল আনন্দ ধারনের যায়গা কোথায়? দীর্ঘ কাল পরে হলেও মহান রবের এ অনুগ্রহ তাদেরকে আরেকবার বাধ্য করে কৃতজ্ঞ সিজদায় লুটিয়ে পড়তে।

শিশু হামযা এখন মাতৃগর্ভের বাহিরে। উত্থান-পতনের লীলাভূমি এই পৃথিবীতে। আরদে মুকাদ্দাসার হালাব নগরিতে। একটি বরকতময় দ্বীনি পরিবারে। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে। হামযা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। দ্বীনের আলোয় আলোকিত ঈমানের নুরে নুরান্বিত পবিত্র পরিবেশে।

হালাব শহরের চারপাশে শকুনের থাবা। পেঁচার চেচামেচি, সুন্নি বিদ্বেষী যিনদিক শিয়াদের কদর্য আস্ফালন। কিন্তু এই পরিবারটি এসব থেকে দুরে। নিরাপত্তা ও প্রশান্তির ছায়া বেষ্টিত তল্লাটে। হামজার বাবা যদিও নিয়মতান্ত্রিক কোন আলেম নন, তবে ইসলামী জ্ঞানে সাধারণ দশজন আলেমের চেয়ে জানাশুনা তার কম নয়। তাকওয়া পরহেযগারীতে তিনি সকলের প্রিয় মুখ। সীরাত পাঠতো তার শয়ন ও স্বপনের সঙ্গী। নবাগত সন্তান কে নিয়ে সদা তাঁর একই জল্পনা-কল্পনা। আমার ছেলে দেশের আর দশটা ছেলের মত হবেনা। সে তো সেই হামযার (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধরে রাখবে তার নামের খ্যাতি। সে হবে নবী প্রেমের জীবন্ত প্রমাণ। নবী বিদ্বেষীদের জন্য আগুনের গোলা। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে ছেলে হামজাকে গড়তে থাকে। সেই হামজার মত করে। ঈমান-ইখলাস, তাকওয়া-তাহারাত, বীরত্ব-সাহসিকতা, বদান্যতা-নৈতিকতা মোটকথা সীরাতে নববীর আলোকে উন্নত চরিত্রের সকল শাখায় একটু একটু করে আগে বাড়তে থাকে হামযা। পূন্যবান বাবা-মায়ের হাত ধরে।

হামযা এখন বড় হয়েছে। পিঠের হাড় মজবুত হয়েছে। চেহারায় তার বীরত্বের ছাপ। চালচলনে আভিজাত্যের ছোঁয়া। প্রতিবেশি, এলাকার লোকজনের কাছের, দূরের সকলেই তার প্রশংসা করে। তার মেধার, অসিম সাহসিকতার, উন্নত চরিত্রের, মাধুরি মেশানো আচরণের। বাবা মা ও তার বিমুগ্ধকর আচরণে অবাক। গুনবান ছেলেকে দেখলে কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় মন, প্রশান্তিতে শীতল হয়ে আসে চক্ষু যুগল। হামজা একজন যুবক, সুঠাম দেহ, উজ্জ্বল ললাট, দীপ্তিময় চেহারা অঙ্গ সৌষ্টবের ভাজে ভাজে দোল খায় পরম চাঞ্চল্য আর উদ্যমতা। হামযা সুন্দর এক যুবক, কান্তিময় যৌবনের সুসিক্ত আভা। গোলাপের মত সুন্দর। গায়ের রং সাদা তুষার কনার মত সাদা। উপরওয়ালা দিয়েছেন তাকে ঐশ্বরীক সৌন্দর্য। ফিরিস্তা সূলভ স্বভাব, প্রতিটি চাহনিতে, আচরণে-উচ্চারণে পবিত্রতার ছোঁয়া। তার মুখয়বয়ব জুড়ে আনুগত্যের ছাপ।

****

সকলের ভালবাসায়, স্নেহ মমতায় হামজা জীবনের ২১ টি বসন্ত পার করেছে। এখন সে এক পূর্ণ যুবক। নিজ এলাকার গন্ডি পেরিয়ে এখন তার দৃষ্টি শামের বিভিন্ন অঞ্চলে। হামযা দেখতে পেল অসভ্য পশুসুলভ কিছু মানুষ শামের ভূখন্ডে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বীভৎস চেহরায় মানুষের সম্পদ ও সম্ভ্রম লুট করে যাচ্ছে। মানুষরুপী হায়েনারা মানবতার বুকে তাদের পৈশাচিক দন্ত বসিয়ে চাবাচ্ছে। কলজে চাবানো রক্তে লাল হয়ে গেছে তাদের নাপাক ঠোঁটগুলো। তাদের দানবাকৃতি অস্ত্রের সামনে অসহায় মানবতা কান্নার অনুমতিটুকু পাচ্ছে না। অসহায় মানুষের দূর্দশা দেখে হামযা সিদ্ধান্ত নেয়, পশুত্বের কাছে মনুষত্বের এমন অসহায় পরাজয় মেনে নেওয়া যায় না।

স্বজাতিকে এমন নির্যাতনের মুখে রেখে আত্ম জীবনে নিবিষ্ট হওয়া হামযার জন্য কখনোই শোভা পায়না। এই দানবের প্রতিরোধে যদি কেউ এগিয়ে না আসে আমি একাই যাব। নিজের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও মুক্ত করব পীড়িত মানবতা। হামযা ভাবতে থাকে কিভাবে কি করা যায়। কোন পথে আগালে কুখ্যাত শিয়াদের বিষদাঁতগুলো উপড়ে ফেলা যায়। মানবরুপী পশু আসাদ ও তার বাহিনীর দৌরাত্ব বন্ধ করা যায়। শিয়াদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া, স্বজাতিকে মুক্ত করার এই ভাবনায় কাটতে থাকে হামযার দিনমান। সাঝ সকাল ।

****

কয়েক দিন যাবৎ হামযা বেশ চিন্তিত। তার চলাফেরায় ব্যতিক্রম অবস্থা বিরাজ করছে। তার চোখ মুখ জুড়ে দুঃশ্চিন্তার ছাপ। পড়ন্ত বিকেলে পাহাড় সারির দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। অন্ধকার রাতে আকাশের পানে তাকিয়ে কি যেন প্রার্থনা করে। সাথীদের সাথে চলাফেরায় তেমন আর উচ্ছলতা নেই। সদা বিষন্ন অস্থির। যেন কিছু একটার অপেক্ষায় সে অধীর আগ্রহে আছে। হাদিসে পাকে আছে

اذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه

আল্লাহ তায়ালা যখন কোন কিছু ঘটাতে চান তখন তার উপকরণগুলো নিজ হাতেই সাজিয়ে দেন।

ততদিনে শুরু হয়ে গেছে শামের মোবারক জিহাদ। আহলে হক ও যিন্দিকের সংঘাত, ইসলাম ও কুফুরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মাধ্যমেই সুগম হবে ইমাম মাহদীর আগমন পথ। এখান থেকেই তৈরী হবে সুসংবাদবাহী শামের সেই মুজাহিদ দলটি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের সাথে মিলিত হবার উৎসাহ দিয়ে গেছেন। একাধিক হাদিসে তাদের প্রশংসা করে গেছেন। এ দলটির হাতেই বিজিত হবে আরদে শাম। দামেশক নগরী, গুত্বা শহর। ইমাম মাহদীর খেলাফতের রাজধানী।

শামের ভূমিতে জিহাদ শুরু হয়ে গেছে নব উদ্যমে। যুবকরা ছুটে আসছে বাধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত। দলে দলে নাম লিখাচ্ছে শহীদী হামলায়। শামের যুবকরা একত্রিত হচ্ছে কালো পতাকা তলে। জাবহাতুন নুসরার ব্যানারে। আবু মুহাম্মাদ ফাতেহ আল জাওলানীর নেতৃত্বে ।

হামযার এ কদিনের অস্থিরতা ছিল আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়। হামযা গভীর রাতে আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করেছিল হে আল্লাহ! আমি এক দূর্বল বান্দা। কুখ্যাত কাফেরদের বিশালদেহী ট্যাংক আর গোলা বারুদের সামনে আমার শক্তি সামর্থ বলতে কিছুই নেই। তুমিই কোন উপায় বের করে দাও। এই দানবরুপী হায়েনাদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর কোন একটা ব্যবস্থা করা দাও। হে আল্লাহ! শুনেছি ইরাকের ভূমিতে যুদ্ধ চলছে। ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে। সেখানে আহলে সুন্নাহ নিপীড়িত হচ্ছিল মার্কিন ও তাদের কৃতদাস রাফেযী যিন্দিকদের হাতে। এখানেও তো নিপীড়িত হচ্ছে সুন্নাহর সন্তানেরা কুখ্যাত রাফেযীদের

হাতেই। হে দয়াময়! শামের ভূমিতো ইরাকের ভূমি থেকে বেশি দূরে নয়। তুমি এনে দাওনা তোমার নির্বাচিত বান্দাদের মধ্য হতে কাউকে। শামের পবিত্র ভূমিতে। জিহাদের পবিত্র বীজ বুনতে। তোমার হাবীব না বলে গেছেন

فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله

শাম এবং তার অধিবাসীদের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। হে আল্লাহ ! সর্বশেষ আরজি, যে দিনই তোমার নির্বাচিত বান্দাদের কোন জামাত শামের ভূমিতে জিহাদ শুর করবে, তুমি এ অধমকে ও শরীক করো তাদের সাথে। নির্জন রাতের শেষ প্রহরীর কান্নাভরা এই মুনাজাত, অক্ষরে অক্ষরে কবুল হয়ে ছিল আরশের উপর। অল্প কদিনের মধ্যেই শামের ভূমিতে জিহাদ শুরু হয়ে যায়। হামযা তার বুকে অনুভব করতে থাকে সেই মোবারক কাফেলার টান। তার সাথে মিলিত হবার অদম্য স্পৃহা।

****

জাবহাতুননুসরাহ। শামে বিশুদ্ধ মানহাযের জিহাদ সূচনা কারি একটি দল। আল কায়েদার সিরিয় শাখা। এক ধরনের অপ্রস্তুত আর অস্থিরতার মধ্য দিয়েই শুরু করতে হয় কার্জক্রম। তবে আল কায়েদার নেতৃত্ব বলে কথা। পরিস্থিতি যতই ঘোলাটে হোক নিজেদের মানহাজের উপর অটল। শামের জনগণ দীর্ঘদিন যাবত নির্যাতিত। এত দিন তারা অপেক্ষায় ছিল এমনি এক সুদৃঢ় জিহাদী নেতৃত্বের। শামের নিপীড়িত আহত হৃদয়ের আহবানে সাড়া দিয়েই ঘটা করে খোলা হল এই শাখাটি। শাখা ঘোষণার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল জাবহাতুন নুসরার সুনাম সুখ্যাতি। মুজাহিদ ভাইদের বীরত্ব গাথা। হিমস, দামেস্ক, ইদলিব, দের সব খানেই শোনা যায় জাবহাতের কথা। হালাব নগরীও বাদ রইল না। যুদ্ধে সক্ষম যুবকরা প্রতিশোধ স্পৃহায় ছুটে আসতে লাগলো, জাবহাতের মুজাহিদদের কাছে। এক এক কান অতিক্রম করে জাবহাতের সুমিষ্ট আহবান পৌছে গেলো হামযার কানেও। হামযা প্রথম শ্রবনেই দিল থেকে লাব্বাইক বলে উঠলো। কেনইবা বলবেনা, সে তো আল্লাহ তা'আলার নিকট কেঁদে কেঁদে এই দোয়াই করেছিল। বেশ সময় যাবৎ সে তো এমন কোন আহবানের প্রতিক্ষায় অস্থির হয়ে আছে। হামযা প্রথম সারির যোদ্ধাদের কাতারে তার নাম লিখিয়ে নিলো। শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জিহাদকারী জামাতের একজন হয়ে গেলো। আজ থেকে শুরু হয়ে গেলো হামযার নতুন জীবন। তার আকাঙ্খিত অধ্যায়। বাবা মায়ের প্রত্যাশিত পর্ব।

****

হামযা এখন একজন মুজাহিদ। জাবহাতুন নুসরার সক্রিয় সদস্য। সামরিক পোষাক , ক্লাশিনকোভ, যুদ্ধের সরঞ্জামাদী সবই আছে তার কাছে। সামরিক পোষাক পরিধান করে ক্লাশিনকোভটা কাধে ঝুলিয়ে যখন সে আয়নার সামনে দাড়ায় তখন নিজেকে পৃথিবীর সবচে সৌভাগ্যবান মনে হয়। জিহাদী জীবন পেয়ে হামযার আনন্দ যেন আর ধরেনা। এভাবে পার হয় বেশ কিছু দিন। পৃথিবীর একটি চিরায়ত নিয়ম হল আল্লাহর কোন বান্দা যখন আখেরাতের পথে চলতে শুর করে, তখন প্রতারক পৃথিবীর

বাহ্যিক সাজ-সজ্জা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে সুখ সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের কথা, লোভনীয় সব অফার। এটাই হল পরীক্ষার চুরান্ত মুহুর্তটা। যে কারো পা পিছলে যেতে পারে এই লোভনীয় পিচ্ছিল মাঠে। তবে আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা, যাদের তরবিয়ত হয় আরশের ইশারায়, কুদরাত ছায়ায়; তাদের কথা ভিন্ন। আমাদের ধারণা, হামযা তাদেরই একজন। তাই ভোগের মায়াজালে ঘেরা পৃথিবীর রুপ-সৌন্দর্য কখনই আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাকে।

হামযার এক আত্মীয় কয়েক বছর যাবত ইটালী থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন অঢেল ধন সম্পদ। ইটালীর বিভিন্ন শহরে তার ব্যবসা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একাকী সব সামাল দেওয়া অসম্ভব। একজন আমানতদার যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন। হামযা ছাড়া আর কারো প্রতি তার আস্থা নেই। তাই হামযার কাছে ইটালী যাবার প্রস্তাব পাঠালেন। মনে মনে ভাবলেন, এমন প্রস্তাব পেয়ে হামযা অনেক খুশি হবে। কারণ সিরিয়ান যুবকদের অধিকাংশের ঝোঁক ইটালীর প্রতি। পার্থীব ভোগ-সম্ভার পর্যাপ্ত আয়ের খাত, জীবনের নিরাপত্থা সব কিছু মিলিয়ে দেশটি সবার পছন্দের। উজ্জ্বল ভবীষ্যতের প্রত্যাশী যে কেউ যেতে চায় ইউরোপের এই সমৃদ্ধ দেশটিতে। তাই হামযা এই প্রস্তাব কে সৌভাগ্য মনে করেই গ্রহণ করবে। কিন্ত হামযা তো আর দশটি যুবকের মত নয়। তার জীবন আচরণ, আশা-আকাঙ্খা, ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সব কিছুই সতন্ত্র। সাধারণ যুবকদের থেকে ব্যতিক্রম। হামযা যখনি নিজেকে নিয়ে ভাবে তার সামনে ভেসে উঠে নির্যাতিত মানুষের রক্ত স্রোত, পুড়ে যাওয়া জন বসতির কালো ধোঁয়া। আহত নারী-শিশুর রক্ত অশ্রু। এত কিছুর পরও মুসলিম উম্মাহর নির্লিপ্ততা আর ইসলামী বিশ্বের দুঃসহ নীরবতার বিষয় গুলো ভেবে ভেবে হামযা স্থির সিদ্ধান্ত নেয়, না নিজের জন্য নয়; জীবন কাটাতে হবে জাতির জন্য। দ্বীনের জন্য। নিপিড়িত মানবতার জন্য। যত দিন বন্ধ না হবে এই নির্যাতন। মুক্ত না হবে মানবতা, ততদিন জীবনের কোন আনন্দ নেই। ভোগের কোন গন্ধ নেই। হামযার অন্তর বিগলিত; জান্নাতের পবিত্র পরিবেশে বসে, মহান রবের দিদার লাভের আগ্রহে। পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ মূল্যহীন তার দুচোখের সামনে। জমকালো সমুদ্রবীচ, বিশ্ব বিখ্যাত পার্ক, সবার প্রিয় পর্যটনকেন্দ্র; কোনই গুরুত্ব পায়না তার কাছে। সে তাঁর আত্নীয়ের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তার আত্নীয় তাকে বিভিন্ন রকম বুঝাতে থাকে। সে দেশের সৌন্দর্য এবং সেখানে তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এর কথা শোনাতে থাকে। যাতে তার মন কিছুটা নরম হয়। সব কিছুর পরও হামযার একই জবাব, আমি শামের ভূমি ছেড়ে কোথাও যাবোনা। আমার ভবিষ্যৎ সেখানে নয় এখানে। হামযা বুঝতে পেরেছে হৃদয়ের গভীর থেকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা। আখেরাতের চিরস্থায়ীত্বের কথা। তাই সকল প্রলোভনের সামনে সে অটল। পাহাড়ের ন্যায়। তাঁর অবিচলতার সামনে সব প্রলোভন হার মানতে বাধ্য । তাই এবারের মত তাঁর আত্মীয়টি ফিরে যায়। এর কিছুদিন পর তার আত্নীয় আবার আসেন। নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসে। প্রিয় হামযা! আমি বুঝতে পেরেছি, দ্বীনের মূল্য তোমার কাছে জীবনের চাইতে বেশি। স্বজাতির মুক্তিকে তুমি আপন ভবিষ্যতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ। ভালো কথা। তোমার মত যুবকের এমনই হওয়া চাই। তবে আমি তোমার কল্যাণকামী। আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে এই যুদ্ধের শেষ নাগাদ বাঁচিয়ে রাখেন। বাশারের পতন হয়ে যায়। তখন না হয় চলে এসো ইটালীতে। হামযা এ প্রস্তাবে কিছুটা থমকে যায়। নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে যমীনের দিকে। কয়েক মিনিট পর মাথা তোলে। চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ। শান্ত আওয়াজ তবে বলিষ্ট। আত্নীয়কে লক্ষ

করে বলে- না ভাই ! এমনটা কখনো হবে না। এই পথ অনেক দীর্ঘ। টার্গেট অনেক দূরে। আমরা যেদিন বাশারের পতন ঘটাবো এর পরদিন শুরু করবো নতুন যাত্রা। নব উদ্যমে। আল কুদসের পানে। হামযার এমন বলিষ্ঠ জবাব শুনে তার আত্মীয় হাল ছেড়ে দেয়। সে মনে মনে বলে, না। হামযার অন্তর অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। পার্থিব কোন লোভ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। মহান আল্লাহর সাহায্যে হামযা এই পরীক্ষায় শতভাগ সফল। তার আখেরাতের টান বিজয়ী হয়েছে। দুনিয়া তার সামনে পরাজিত হয়েছে।

****

হামযার মনে অনেক ব্যথা। স্বজাতির দুর্দশার কারণে। যুবকদের পিছুটানের কারণে। ব্যথাতুর হৃদয়ে সে চালিয়ে যাচ্ছে জিহাদী তৎপরতা। কখনো রিবাতে, কখনো সম্মুখ সমরে। একবার তাকে যুবকদের একটি গ্রুপের সাথে পাঠানো হয়। গ্রুপের অধিকাংশ সদস্যই নতুন জিহাদে এসেছে। তাদের অতীত জীবনটা বেশী সুন্দর ছিলনা। হামযা দেখল তারা ধুমপান করে। নামাজে অলসতা করে। সে তাদেরকে বারণ করল। সে তাদেরকে ধরে ধরে বুঝাতে লাগলো- আমরা কিভাবে আল্লাহর সাহায্য পাবো অথচ আমরা তাঁর নাফরমানী করি। তাদের কয়েক জন মানলো। অনেকেই মানলো না। হামযা আমীরের অনুমতি নিয়ে তাদের গ্রুপ থেকে বেরিয়ে এল। এরপর মুহাজিরদের ক্যাম্পে চলে আসলো। যারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে ঘর-বাড়ী বিসর্জন দিয়ে ছুটে এসেছে জিহাদের ভূমিতে। তাদের আমল-আখলাক ইবাদত-ইখলাস হামযাকে প্রভাবিত করলো। সে ধীরে ধীরে তাঁদের ঘনিষ্ট হয়ে গেলো। একদিন সন্ধায় হালাবের এক মসজিদে আমি নামাজ পড়ার জন্য গেলাম। নামাজান্তে সব মুসল্লিরা বেরিয়ে গেলো। মসজিদের কোনে এক যুবক বসে আছে। আমার সাক্ষাতের অপেক্ষায়। তার আপাদ মস্তক লজ্জায় ঢাকা। আমি তার কাছে গেলাম। হাত বাড়িয়ে মুসাফা করলাম। কিছুক্ষণ তার সাথে গল্প করলাম। তখন থেকে সে আমার হৃদয়ে স্থান পায়। আমার দীর্ঘ দিনের এক বন্ধু ছিল। শিক্ষা জীবন থেকে জিহাদী জীবন, সব সময় আমরা একে অপরের সতীর্থ ছিলাম। নাম **আবুল বারা আল মাদানী** (আল্লাহ তায়ালা তার শাহাদাত কবুল করুন)। আমার বন্ধু আনসার যুবকদের মজলিসে আগ্রহ নিয়ে বসতেন। তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিতেন। তাদের সাথে গল্প করতেন। একবার তিনি হামযার সাথে বসলেন। পরিপাটি চালচলন স্থিরচিত্ত ও চিন্তার গভীরতা দেখে বিমুগ্ধ হলেন।

হামযাও আবুল বারা ভাইয়ার আচরণে প্রীত হল। মজলিস থেকে বের হয়ে হামযা তার সাথীকে বলল, আজ যে ভাইটির সাথে পরিচিতি হল তিনি বড় ভালো মানুষ। তার আচরণে আমি মুগ্ধ। আমার পুরো জীবনে তার চেয়ে ভালো মানুষ আর দেখিনি। হামযাদের এলাকায় অনেক গুলো দ্বীনি প্রতিষ্টান রয়েছে। এর মাঝে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানটিতে সাপ্তাহিক একটি মজলিস হয়, আনসার-মুহাজিরদের সাক্ষাৎ মজলিস। এই মজলিসের উদ্দেশ্য আনসার-মুহাজিরদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও পারস্পরিক মত বিনিময়। হামযা এই মজলিসের নিয়মিত সদস্য। মুহাজিরদের আচার-আচরণ ও ময়দানের কারগুজারী শুনে হামযা আভিভূত হয়। একদিন আমাকে কানে কানে বলে, শায়খ! আমি এদের সাথে মিলে কাজ করতে চাই।

****

এর পর থেকে সময় বইতে থাকে। দিন গিয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ কেটে মাস। হামযার সাথে প্রতিদিন আমার সাক্ষাৎ হয় মসজিদে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। আমি লক্ষ করেছি হামযা নামাজের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। রোদে বৃষ্টিতে, প্রবল তুষারপাতের সময়ও আমি তাকে দেখেছি মসজিদে আসতে। আমার বন্ধু আবুল বারা একজন ভালো কারী। আল্লাহ তায়ালা তাকে যেমন সুর দিয়েছেন, তেমন দিয়েছেন উচু আওয়াজ। তিনি মাগরিব-এশার মধ্যবর্তী সময়ে একটি হালাকা চালু করেন। কুরআন মশকের হালাকা। এই হালাকায় সর্ব প্রথম যেই ছাত্রটি উপস্থিত হত সে হল হামযা। তার আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে অনুমিত হয়, যেন দীর্ঘকাল সে এমন একটি হালাকার অপেক্ষায় ছিল। হামযার আগ্রহ দেখে আবুল বারা ভাই তার প্রতি বেশ গুরুত্ব দিতেন। একদিন আবুল বারা ভাই তাজবীদের নিয়ম-কানুন সম্বলিত কিছু পৃষ্ঠা এনে হামযার হাতে দিলেন, তা পড়ার জন্য। হামযা তা পড়ে, বুঝে মুখস্ত করে আবুল বারা ভাইকে শুরু-শেষ শুনিয়ে দিল। আমি হামযার কুরান তেলাওয়াত শুনতাম। যেন বসন্তের সোনালী দিনে কোকিলের গান। কিংবা ভোমরের গুঞ্জরণী। একবার হামযা জোর আবেদন জানায়, আমি ও আমার বন্ধু তার বাড়ী যেতেই হবে। যাতে তার সাথে সম্পর্কটা আরো গাঢ় হয়। আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আমরা সম্মত হই । একটি তারিখ নির্ধারণ করি। কিন্ত নির্ধারিত তারিখ আসার পূর্বেই আমার বন্ধু আবুল বারা আমদের ছেড়ে চলে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় বরণ করেন। ঘনিষ্ট বন্ধুর বিয়োগে কে ব্যথিত না হয়ে পারে। কিন্তু আমার অবস্থা ছিল ব্যতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা তাকে কবুল করেছেন শাহাদাতের জন্য, এই ভাবনা আমাকে আনন্দিত করে। কারণ আমার বন্ধুটি দীর্ঘ দিন যাবৎ শাহাদাতের অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। কিন্তু যখন ভাবি আমার গুনাহের কারণে শাহাদাতের নিয়ামত বিলম্বিত হচ্ছে তখন মনটা বিষিয়ে উঠে। বন্ধুটির শাহাদাতের পর হতে হামযাকে প্রায়ই বিষন্ন মনে হত। আর পূরণ হল না তার আবদার। যাওয়া হলনা তার বাড়িতে । আবুল বারা ভাই একাই চলে গেলেন । আমাদের ছেড়ে । জান্নাতের বাড়ীতে।

২য় পর্ব

এর কিছু দিন পর হামযা আমার কাছে এল। পরামর্শের জন্য। হামযা বলল- হজরত আমি আমার জীবনটাকে আল্লাহর পথেই ব্যয় করতে চাই। জিহাদই হোক আমার জীবন। শাহাদাতেই হোক আমার মরণ। তবে একটি বিষয় আজ কিছু দিন যাবৎ আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। জিহাদের পথে কত ধরণের ভাই আসেন। তাদের অধিকাংশেরই তেমন পড়ালেখা নেই। দ্বীনি ইলমের পর্যাপ্ত কমতি। কিন্তু জিহাদ তো ইলম ছাড়া চলতে পারেনা। ময়দানের কাজে ইলমের প্রয়োজন সীমাহীন। আমাদের একজন শায়েখের কত ব্যস্ততা। এক সাথে অনেকগুলো সেক্টর সামলাতে হয়। যদি ওলামাদের সংখ্যা আরো বেশী হতো তাহলে হয়তো প্রতিটি সেক্টরে কর্মতৎপরতা আরো কয়েকগুণ বেড়ে যেত। জিহাদের কাজে আসতো নতুন গতি। এসব ভেবে আমার মনে ইলমের প্রতি টান অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এখন তো প্রতিটি বালেগ মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন। এই অবস্তায় জিহাদ ছেড়ে ইলমের পথে চলা কিভাবে বৈধ হবে। তাই আমি পরামর্শ চাচ্ছি। আপনিই পারবেন এ বিষয়ে আমাকে সঠিক নির্দেশনা

দিতে। এততুকু বলে হামযা তার কথা শেষ করল। আমি হামযাকে খুব ভাল করেই চিনি। তার মেধা, ধী-শক্তি, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা সকলের কাছে প্রশংনীয়। সে একজন ভাল আলেম হলে জিহাদের ময়দানে তাকে দিয়ে অনেক কাজ নেয়া যাবে। আর ইলমী জগতে ভাল পর্যায়ে পৌঁছতে তার সময়ও বেশি একটা লাগবে না। পূর্বাপর সব কিছু ভেবে আমি তাকে বললাম, দেখ হামযা! আল্লাহর ইচ্ছায় মুজাহিদদের সংখ্যা এখন কম নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে ছুটে এসেছে সাদিকীনদের একটি বিরাট দল। তাই আনসার মুহাজির মিলিয়ে মুজাহিদদের সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর। কিন্তু জিহাদ পরিচালনাকারী আহলে ইলম, আকীদা বিশুদ্ধকারী ওলামায়ে কেরাম, বিজিত অঞ্চলে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী ফকীহ আমাদের মাঝে অনেক কম। যা তুমিই দেখতে পাচ্ছো। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যোগ্যতা দিয়েছেন। তুমি কিছু কাল ইলমের পথে কাটিয়ে এ যোগ্যতাকে আরো শানিত করো । আর শোন! জিহাদ ফরজ হবার পর জিহাদের প্রতিবন্ধক অন্য কোন আমলে নিজেকে লিপ্ত করা হারাম। এ মাসআলা আপন স্থানে ঠিক আছে। তবে এ মাসআলা তার ক্ষেত্রে যে মুজাহিদদের থেকে বিচ্ছিন্ন। জিহাদী তানযিমের তৎপরতার বাহিরে। কিন্তু তুমিতো মুজাহিদদের থেকে বিচ্ছিন্ন নও। তানযীমের বাহিরে নও। তোমার ইলম অর্জন তো জিহাদের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। বরং জিহাদকে সহীহ মানহাজে পরিচালিত করার জন্যই তোমার ইলম মুজাহিদদের আমল-আকীদা পরিশুদ্ধ করার লক্ষেই তোমার ইলম। তাই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। আমার পরামর্শ পেয়ে হামযা নতুন করে হাঁটতে শুরু করল ইলমের পথে। জিহাদ ও ইলমের মাঝে সেতু বন্ধনের লক্ষে।

****

হামযা স্থানীয় একটি মা'হাদে ভর্তি হয়ে যায়। শরয়ী মা'হাদ। হামযা মা'হাদে যাতায়াত করতে থাকে, সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। উন্মুখ মেধা নিয়ে। আমি তার মাঝে লক্ষ করি সাফল্যের ছাপ। উজ্জল জীবনের চিহ্ন রেখা। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি প্রত্যাশা নিয়ে। ছলাছা এ জাতিয় বেশ কিছু মতন (কিতাবেরমুলপাঠ) মুখস্ত করে ফেলে। ভালো ভাবে প্রতিটি মাসআলা বুঝে বুঝে। ইলমের জগতে তার দ্রুতগামিতা দেখে আমি নিশ্চিত হই ভবিষ্যতে সে ইলমের মিনার হবে। দরসের সময় উস্তাদ মাসাআলাগুলোর যে ব্যখ্যা দিতেন সে সযত্নে তা লিখে রাখতো। তার খাতায়। আশপাশের ছাত্রদেরকেও উৎসাহ দিতোলেখার জন্য। লেখা পড়ার উন্নতি মুলক কাজে সকল কাজে সাথী ভাইদের সাহস যোগাতো। মা'হাদে তার ব্যচে ছাত্র সংখ্যা ২২ জন। ১ম এবং ২য় পরীক্ষায় তাদের মঝে ১৩ জন ফার্স্ট ডিভিশন লাভ করে। হামজার নাম্বার ছিল সবার উর্ধ্বে। ফলাফলে তার অবস্থান মা'হাদের সবার শীর্ষে। প্রতিটি প্রশ্নের উতর দিয়েছে পূর্নাঙ্গ। মন মাতানো, হৃদয় শীতল কারী। তাই আমি তাকে পুরস্কার দেওয়ার মনস্থ করি। মা'হাদের সকলের সামনে তাকে পুরস্কৃত করি। লেখা-পড়াকালীন তার অভ্যাস ছিল- যখনই সে কিতাবে কোন মাসআলা শিখতো বাড়ীতে এসে প্রথমে ছোট বাচ্চাদেরকেও তা শিখাতো। এরপর তাদেরকে সুরা ফাতিহা ও ছোট ছোট সুরা মুখস্ত করাতো। এরপর নামাজের সময় তাদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে যেত। তার কোমল হৃদয়ে শিশুদের প্রতি

ভালবাসা ছিল অসাধারণ। একবার ভূনা মুরগি খাবার ইচ্ছে হল। বাবাকে বললে বাবা বাজার থেকে কিনিয়ে আনলেন। মুরগি আনা হলে ছোট ছোট ছেলেরা তার আস-পাশে এসে ভীড় জমায়। হামযা মুরগীর কাটা কাটা টুকরাগুলো এক এক করে তাঁদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। নিজের খাওয়ার জন্য এক টুকরাও রাখেনি। পরহিতৈশী আর শিশুপ্রীতির কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিন হামযা আমার কাছে মুখবন্ধ প্যাকেটের একটি হাদিয়া পাঠালো। প্যাকেট খুলে দেখলাম দামী দামী কিছু খাতা আর উন্নতমানের কয়েকটা কলম। শামের ভূমিতে এমন উন্নতমানের খাটা-কলম এই প্রথমবার দেখলাম। প্যাকেটির ভিতর একটি চিরকুটে লেখা মুজাহিদ ওলামাদের চেয়ে এই খাতা কলমের অধিক যোগ্য আমি আর কাউকে মনে করিনা। ইতি হামযা।

****

মা'হাদে হামযার প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনার পর্ব শেষ। আমি তাকে বললাম,হামযা এখন তোমার ইচ্ছা। তুমি মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ শিবিরেও যেতে পারো, আবার ইচ্ছে হলে মা'হাদে শরয়ী উচ্চ বিভাগেও পড়তে পার। হামযা স্বভাবজাত মুচকি হেঁসে বলল,শায়খ! আপনি আমার জন্য যা পছন্দ করেন আমি সে পথেই চলবো। আমি বৃহৎ স্বার্থের লক্ষ্যে তাকে পরামর্শ দেই, তুমি মা'হাদে শরয়ী উচ্চ বিভাগে ভর্তি হও। হামযা আবার শুরু করে পড়াশোনা। দ্বিগুণ প্রত্যয় নিয়ে। উন্নত চরিত্র, মণোমুগ্ধকর আচরণ, নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম আর নিভৃত অধ্যাবসায়ের মাঝে দিন-মান ছুটে চলেছে সে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের পাণে। নামাজ, ঘুম আর খাবার-দাবার বাদে হামযার সময় কাটে তিন কাজে। দীর্ঘ একটা সময় সে নিমগ্ন থাকে কিতাবের পাতায়। পড়া শেষ হলে দৈনিক মা'হাদের কিছু কিছু কাজ করে দেয়। যেমন পাকঘর পরিস্কার করা, হাড়ি পাতিল ধুয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আর বাকী সময় কুরআন তিলাওয়াত। এভাবে গড়াতে থাকে মা'হাদে আলীর সময়কাল। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে যায় জিহাদী গ্রুপগুলোর মাঝে পারস্পরিক সংঘাতের ফিৎনা। আরেকটু খুলে বলি, দাওলাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের সীমালঙ্ঘন। (এক কথায় ভয়াবহ খারিজী ফিৎনা-অনুবাদক) ফলে এক পর্যায়ে মা'হাদ বন্ধ হয়ে যায়। একদিন হামাযা আমার কাছে পড়ার জিন্য কিছু কিতাব চায়। আমি প্রথমে তাকে সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহঃ এর মাআলিম ফিত ত্বরীক (আগামি বিপ্লবের ঘোষণা পত্র) কিতাবটি দেই। তার পর মুতুনে তালিবিল ইলম, ইমাম নববীর আল আরবাঈন, ইত্যাদি কিতাব এক এক করে দিতে থাকি। যখন আই এস যোদ্ধারা ভ্রাতৃিঘাতি যুদ্ধের সূচনা করে তখন হামযা নিরপরাধ মুসলিমদের রক্তপাতের আশংকায় জর্জরিত। তাই সে সাথীদের মাঝে ঘুরে ঘুরে বোঝাতে থাকে, মুসলিমদের রক্তের মুল্য। অবৈধ রক্তপাতের মন্দ পরিনতি। হামযা সাথীদেরকে বলে, আমাদের উপর ফরজ হল আমরা হয় নুসাইরি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করবো নয়তো অস্ত্র ফেলে ঘরের কোনে বসে যাবো। কিন্তু নিজেদের মধ্যকার সংঘাতে পা বাড়াবোনা। (এটা খারেজী ফেতনার প্রথম সময়ের কথা। যখন তাদের ফেতনার চুড়ান্ত রুপ পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। এরপর যখন মুজাহিদরা দেখে নেন বাগদাদী ও দাওলার আসল চেহারা। তখন তাদের বিরুদ্ধে ও শুরু হয় যুদ্ধ। আহলে হক আর খাওয়ারেজদের মধ্যকার যুদ্ধ। অনুবাদক) সংঘাতের এই দিন গুলোতে এলাকায় কারফিউ জারী থাকতো। কিন্তু

মসজিদপ্রীতি আর জামাতের টান তাকে ভুলিয়ে দেয় কারফিউয়ের কথা। বাবা মায়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সে মসজিদে এসেই পড়তো।

****

আজ রবিউস সানির ৪ তারিখ। ১৪৩৫ হিজরী। সকাল বেলা হামযা শুনতে পেল আজ বিকেলে বিদ্যুৎ থাকবে না। ঘোষণা শুনে প্রথমেই হামযার চিন্তায় এল তাহলে তো মসজিদে বাতি জলবেনা। আল্লাহর ঘর অন্ধকার থাকবে, এটা কি ভাবে হয়। হামযা সিদ্ধান্ত নেয় আজ বাজারে গিয়ে প্রথমেই মোম কিনবে। আল্লাহর ঘরে আলো দেওয়ার জন্য। এতে আল্লাহ তায়ালা আলোকিত করবেন তার আত্মার ঘর। হৃদয়ের অন্তপুর। কিছুক্ষণ হল হামযা নাস্তা সেরে তার রুমে বসে আছে। হামযার মনটা আজ বেশ ফুরফুরে। এক অদৃশ্য আনন্দের ছোয়া বার বার স্পর্শ করছে তার স্বচ্ছ হৃদয়কে। হামযা ভেবে পায়না, আজ কিসের এত পুলক, এত আনন্দ। অদৃশ্য সওগাতের হাতছানি। আনমনে আজ হামযা অনেক কিছু ভাবতে থাকে। শৈশব কাল, কিশোর জীবন। যৌবনের শুরুতেই নিষ্ঠাবান মুজাহিদদের সংশ্রব, আলমী জিহাদের নিতি নির্ধারক, সুসংবাদ প্রাপ্ত, কালো পতাকাবাহী জামাত তানযীমুল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততা, আবুল মুছান্না দাঃবাঃ এর মত যোগ্য শাইখের মমতাময় সাহচর্য। শহীদ আবুল বারা ভাইয়ার সাথে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। প্রত্যেকটাই আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। বিশাল অনুগ্রহ। আবদের প্রতি মাবুদের বাছা বাছা দান। এসব নিয়ামতের কথা ভেবে ভেবে রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় হামযার মাথা নুইয়ে আসে। ইচ্ছে হয় পড়ে থাকতে, দিনের পর দিন কৃতজ্ঞ সেজদায়। (হামযা ভাবে আবুল বারা ভাই তো বয়সে আমার থেকে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। পূর্ণ বিয়ের বয়স। ধন-সম্পদ, রুপ-সৌন্দর্য, বংশীয় প্রভাব কোন কিছুরই তো অভাব ছিলনা। তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পেলে তো হালাবের যে কোন মেয়ে তার জন্য পাগল ছুটে আসতো। কিন্তু তিনি বিয়ে করার পূর্বেই চলে গেলেন। মাটির হুরদের ছেড়ে নূরের হুরদের ঘরে। রাসূল (সাঃ) তো বলেছেন আল্লাহ তায়ালা একজন শহীদ কে ৭২ জন হুর দিবেন। এক শহীদ কে বিয়ে করাবেন ৭২ হুরের সাথে। এ সময় হামযার মনে পড়ে যায় সূরা তুরের ২০ নম্বর আয়াতটি। কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি হামযকে বেশ আনন্দ দেয়। কারণ পৃথিবীতে এমন যুবক একজনও নেই, বিবাহের কথা শুনে যার আনন্দ লাগেনা। কিন্তু বিবাহের কথা মাথায় আসতেই শুরু হয় রাজ্যের চিন্তা। রুপ-গুণ, দ্বীনদারী, শিক্ষা-দীক্ষা সব মিলিয়ে মনের মত বধু পাওয়া যাবে কি? কোন আলেম কে আনবো বিবাহ পড়ানোর জন্য? বাড়ীর পরিবেশ সুন্দর করা , বাসর ঘর সাজানো। স্ত্রীকে রাখার জন্য উত্তম গৃহের ব্যবস্থা। কত কি? কিন্তু কোন সৌভাগ্যবান যদি এমন হয় যার বধু নির্বাচনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন, যার বিবাহ পড়াবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। বাসর ঘর হবে জান্নাতি ঝর্নার পাশে নির্মিত, নয়নাভিরাম গাছপালা বেষ্টিত, আড়ম্বরপূর্ণ কক্ষে। আরশের ঠিক নিচ দিকে। স্ত্রীর ভরণ-পোষনের কোন টেনশন নেই। উন্নত বাড়ী বানানোর কোন চিন্তা নেই। খাও-দাও ফুর্তি করো। আর প্রেয়সীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। জান্নাতের হৃদয় কাড়া, মন মাতনো বিভিন্ন স্থানে। কখনো নৌ বিহারে, কখনো বা আকাশ যানে, কখনো

দুধের নদীতে, কখনো মধুর নহরে, অফুরন্ত আনন্দ। অনাবিল ভোগ আর কল্পনাতীত শান্তি-বিলাস। সূরা নূরের ২০ নাম্বার আয়াতটিতে হামযার মনের কথাটিই বলেছেন আল্লাহ তায়ালা-

-আর আমি তাদেরকে বিয়ে পড়িয়ে দেব জান্নাতি হুরদের সাথে।

হামযার হৃদয় মন জুড়ে শুধু জান্নাতি হুরদের কল্পনা। জান্নাতি বিয়ের অপেক্ষা। হামযা মনে মনে প্রার্থনা করে হে আল্লাহ! আমি দুনিয়ার বিয়ে চাইনা আখেরাতের বিয়ে চাই। আমি মাটির হুর চাইনা, নূরের হুর চাই। হে আল্লাহ আবুল বারা ভাইয়ের মত আমাকেও নিয়ে যাও তোমার কাছে। তাঁর মত আমাকেও বিয়ে দিয়ে দাও তোমার হাতে। হুরে ঈনদের সাথে। অবচেতন মনে হামাযা ভাবতে থাকে, দুনিয়ার ঐ পারের কথাগুলো। মাঝে মাঝে দুলতে থাকে আনন্দের আতিশয্যে। পরম প্রাপ্তির কল্পনায় হারিয়ে যায় অনেক দূরে। হামযা এভাবে দীর্ঘক্ষণ একা একা কামরায় বসা। হঠাৎ দরজাটা নড়ে উঠে। হামযা সম্বিত ফিরে পায়। দরজা খুলে দেখে তার আম্মু এসেছে। মাকে সালাম দিয়ে হাত ধরে এনে তার খাটে বসায়। হামাযা তার বাবা-মায়ের নয়নমনি। কোনদিন একটি নির্দেশেরও অন্যথা করেনি। মা হামজার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। হামযার দিকে তাকিয়ে বলে বাবা হামযা! তোমাকে নিয়ে আমদের কত স্বপ্ন। তুমি লেখা পড়া করেছ, মানুষের মত মানুষ হয়েছ। তোমার বাবার স্বপ্ন ছিল তুমি মুজাহিদ হবে। রাসূলের (সাঃ) চাচা হামজার মত বীর যোদ্ধা হবে। সে স্বপ্নও পূরণ হয়েছে। এখন তোমার বয়স হয়েছে। আমরা চাচ্ছি এখন ঘরে কাউকে বধু করে আনতে। আমি তোমার জন্য এই তল্লাটের সবচে' রুপসী গুণবতী মেয়েটাকে পছন্দ করে রেখেছি। আজ তোমার বাবা বলে গেলেন, তোমার মতামত জানতে। হামযা মনযোগ দিয়ে মায়ের কথাগুলো শুনলো। কোমল দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, মা! এখনো সময় হয়নি। তবে অপেক্ষা করো মা। সময় অনেক কাছাকাছি হয়ে এসেছে। হামযার মা বুঝতে পারেনি ছেলে কোন সময়ের কথা বলছে। কিসের অপেক্ষায় আছে, যাই হোক ছেলের কথাই ধার্য। আরো কিছু দিন অপেক্ষা করি।

****

হামযা অনেক দিন আগে একসেট সামরিক পোশাক ক্রয় করেছিল। মুজাহিদদের পোষাক, শহীদদের পোষাক। জান্নাতের সবুজ পাখিদের পোষাক। হামযা তখন পোষাক পড়ে নিজেকে পৃথিবীর একজন গর্বিত মুসলিম মনে করতো। নিজেকে সেই হামযার (রাঃ) একজন নগন্য অনুসারী মনে করতো। কয়েক বছর আগে যখন ইলম শিখার জন্য মা'হাদে যাবার সিদ্ধান্ত হয় তখন বড় যত্ন করে স্যুটটি রেখে দেয়। কাচের আলমারীতে। আজ আবার সে তৈরী হচ্ছে ময়দানে যাবার জন্য। সম্মুখ সমরে নুসাইরী বাহিনীর প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু আজকে তো কোন অপারেশনে যাবার কথা নেই। হামযা আজ হঠাৎ করে কেন সামরিক পোষাক পরিধান করলো। হ্যাঁ হামযার অন্তরে আজ এমন কিছু উদিত হচ্ছে যা অন্য কারো বোঝার উপায় ছিল না। হামযা সামরিক পোষাক পরিধান করে যোহর নামাজ পড়তে গেল। নামাজ শেষে আশ-পাশের লোকদের সাথে সালাম মুসাফাহাও

করল। এবং মোম কিনার জন্য বাজারে গেল। বাজারে গিয়ে তার ছোট ছোট বন্ধুদের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের জন্য মিষ্টান্ন ক্রয় করল। হামযা বাজার থেকে ফিরে এসে শিশুদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ করে। শিশুরা খাচ্ছে আর হাসছে। তাদের মুখের নিষ্পাপ হাসি হামযার মনে আনন্দের দোলা দেয়। হামযা তাদের নিষ্পাপ চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবে হায়! বর্বর নুসাইরী বাহিনী কিভাবে হামলা চালায় এই পবিত্র চেহারা গুলোর উপর।

****

এদিকে আসরের সময় হয়ে যায়। হামযা মসজিদের দিকে পা বাড়ায়। তার মা বলে দেয়, বাবা আসরের পর তোমার খালাম্মার বাড়ীতে গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসো। হামযা বলে জি-মা! তাই হবে। জিহাদি পোষাক পরিহিত হামযা মোমগুলো পকেটে নিয়ে মসজিদে চলে যায়। নামাজান্তে সে এলাকার শিশুদের নিয়ে কোরআনের হালাকায় বসে। হঠাৎ করে নুসাইরি বাহিনীর যুদ্ধ বিমান চলে আসে। হামযাদের মসজিদটির উপর। বিকট আওয়াজ ছড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে। তারপর সরাসরি মসজিদটি লক্ষ করে নিক্ষেপ করে একটি ব্যরেল বোমা। চারপাশ কাপিয়ে বিকট শব্দে, বিস্ফোরন। চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় বোমার টুকরো অংশ। শিশুদের অবস্থা ভেবে আমি আতকে উঠি। কিছুক্ষন পর শিশুদের সম্মিলিত অট্র হাসিতে আমি অবাক হই। তারা হাসছে আর গাইছে-

আসাদ হল আস্ত গাধা
নেই কোন উপমা
অবুঝ শিশু মারতে দেখো
ফেলছে ব্যারেল বোমা

একটু পরে আবুন নূর নামে মা'হাদের এক ছাত্র এসে আমাকে বলল হযরত সুসংবাদ। আলহামদুলিল্লাহ! কারো কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললাম, তাহলে তুমি আর হামযা মিলে এখনি বেরিয়ে পড়। কয়েকটি পয়েন্ট খালি পড়ে আছে। আজ থেকে রিবাত চালু করতে হবে। হামযার নামটি মুখে আনতেই দেখলাম আবু আদীব নামে আর এক ছাত্র, হাপাতে হাপাতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। চেহারা বিষন্ন। কণ্ঠ ভয়ার্ত। শায়খ হামযা আমদের মাঝে আর নেই। ব্যরেল বোমার একটি টুকরো তার বুকে আঘাত হানে। ঠিক কলজে বরাবর। তাৎক্ষনিক সে শহীদ হয়ে যায়।

****

হামযার শাহাদাতের সংবাদে আমি সম্বিত হারিয়ে ফেলি। আবু আদীবকে আমি বলি, তুমি ভুল দেখেছ, সে হামযা নয় । অন্য কেহ। হামযা এত তাড়াতাড়ি শহীদ হবেনা। হতে পারে না। তার বার বার বলায় অবশেষে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম।

হামযার শাহাদাতের সংবাদ আমাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। আমার দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বান ডাকে। হামযা তুমি চলে গেলে। এভাবে লুকিয়ে। চুপটি করে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। আকাশের সাথে ভাবের আদান-প্রদান, কুদরতের ইশারা-ঈঙ্গিত কাউকে বুঝতে দিলে না। তোমার এমন অপ্রস্তুত চলে যাওয়া আমরা কিভাবে সইবো বল। হামযার বিচ্ছেদশুন্যতা আমার জীবনে আর পূরণ হবেনা। আমি তাকে নিয়ে শুরু করেছিলাম পথচলা । নির্মাণ করেছি অনেক স্বপ্ন। বুনেছি কত আশা। হামযা স্থান পেয়ে যায় আমার অন্তরে। একেবারে গভীরে। এমন সময় সে চলে যায় গোপনে। নীরবে পাড়ি জমায় আকাশে। সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হে আল্লাহ! আমি হামযার বিচ্ছেদে অনেক কেঁদেছি। শশ্রু ভিজিয়েছি। আমি কেঁদেছি পবিত্র স্বত্বার বিয়োগে। বিরহের কান্না। আমি কেঁদেছি তোমার সাথে তার সাক্ষাৎ প্রাপ্তিতে। আনন্দের কান্না হামযার রুহ চলে গেছে, সবুজ পাখিদের বক্ষে। জান্নাতের বাগানে বাগানে বিচরণের জন্য। হামযার অনুভূতি বড় প্রশংসনীয়। সকাল বেলা সে দুনিয়ার নারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বিকাল হতে না হতেই সে জান্নাতি নারীদের মোহর আদায়ে সক্ষম হয়। তার গাঢ় লাল রক্ত দিয়ে। হে আল্লাহ! তুমি তাকে দান কর, তোমার কুদরতী হাত ভরে। হামযার বাবাকে শান্তনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। আমি তার দুচোখে বাধ ভাঙ্গা জোয়ার দেখেছি। হামযার বাবা ছেলের রক্তাক্ত পোষাকটির পকেটে হাত দেয়। পকেট থেকে বের হয়ে আসে এক বাক্স মোম আর মুতুনে তালিবুল ইলম কিতাবের কিছু পৃষ্ঠা। মোমের বাক্সটি আর পৃষ্ঠাগুলো রক্তে লাল লাল হয়ে গেছে। বাবা হামযার হাতটা তুলে ধরে বলে, হামযা! প্রিয় বাবা আমার ! কাল হাশরে বিচারের দিনে যখন শুনবে আমি গোনাহগার বাবার কথা এমন করে ধরে নিয়ে যেও আমি বাবাকে। জান্নাতের দরজায়, তোমার বাসস্থানের পাশে। হামযার নিথর হাতটি জমীনে পড়ে যায়। বাবা চেয়ে চেয়ে কাঁদতে থাকে। এরপর মোম গুলো হাতে তুলে নিয়ে বলে, বাবা! আমি তোমার কেনা মোমগুলো তোমার হয়ে পৌঁছে দেব। তোমার প্রিয় স্থানে, আল্লাহর ঘর মসজিদে। হামযার পবিত্র জীবন কেটেছে কখনো মসজিদে, কখনোবা পড়ার ঘরে কিতাবের উপর। কখনো আবার ময়দানে আল্লাহ শত্রুর বিরুদ্ধে। তার মৃত্যু এসেছে মসজিদে। আল্লাহর শত্রুর হাতে। কিতাবের পৃষ্ঠা আর মোম পকেটে করে। তার জীবনী দিয়ে সে রচনা করে গেছে উম্মাহর যুবকদের জন্য আলোর পথ, পথের আলো, ইলম ও জিহাদের পথ, ইখলাস ও কুরবানীর পথ । তার জীবন দিয়ে জীবনের শেষ মুহুর্ত দিয়ে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে।

****

হামযার বাবা ছেলের কিতাব গুলো আমার কাছে নিয়ে আসেন। আমি তার কিতাব সংখ্যা দেখে বড় প্রভাবিত হই। হামযার কিতাবগুলো নাড়া চাড়া করি আর মনে মনে বলি, হামযা তুমি মহান, তুমি অসাধারন। শাহাদাতের পর আমদের মাঝে কিছু প্রেম-পত্র আর ভোগ-সামগ্রী রেখে যাওনি। তমি রেখে গেছ ইলমের দফতর, কোরআন সুন্নাহর ব্যখ্যা ভান্ডার। আমরা নির্বাক তোমাকে হারিয়ে, হতবাক তোমার ইলম ভান্ডার দেখে। আমি তার কিতাবগুলোর ভাজে কিছু পৃষ্ঠা পেলাম, তাজবীদের আহকাম লেখা কিছুপৃষ্ঠা। যেগুলো হামযাকে দিয়েছিলো শহীদ আবুল বারা ভাই। শাহাদতের কিছুদিন পূর্বে। পৃষ্ঠাগুলো আমকে শহীদ

হামযার সাথে শহীদ আবুল বারা ভাইয়ার অনেক স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিল। বিয়োগ ব্যথাটা আরেকটু তেঁতে উঠলো। প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে রাখলাম- এক শহীদ থেকে আরেক শহীদের প্রতি। হামযার শহাদাতের পর বেশ কিছু দিন কেটে গেল। কিন্তু বুকের ব্যথাটা এখনো কাটছেনা। চোখের সামনে কত ভাই শহীদ হয়েছেন, কত আপন জনকে হারিয়েছি। এই পবিত্র ময়দানে ব্যথিত হৃদয়ে কতবার কত শহীদের বিদায়ী যাত্রা দেখেছি। তবে যখন ভাবতাম ভাইরা তো চলে গেছেন জান্নাতে, হুরে ঈনদের বাসর ঘরে। তখন ব্যথাটা কেটে গেছে। কিন্তু হামযাকে হারানোর ব্যাথাটা কিছুতেই যেন যাচ্ছেনা। আশপাশে শান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই। সবাই ব্যথিত। আহত, বেদনা ক্লিষ্ট। এই অবস্থায় দিন কাটতে থাকে। আকদিন হামযার কিতাবগুলো ঘাটতে গিয়ে এক কিতাবে একটি কাগজের টুকরা পাই। তাতে একটি আরবী কবিতার কয়েকটি চরণ লেখা। হামযা নিজ হাতে লিখেছে। হয়তো এই হতভাগার সান্ত্বনার জন্যই।

দেখা যদি না হয় বন্ধু দুনিয়ার পথে

দুঃখ পাবার আছে কি তাতে

মৃত্যু যদি হয়কো বাধা মিলনের পথে

দেখা হবেই একদিন জান্নাতে।

যেদিন আবুল বারা ভাই শহীদ হলেন, সেদিন হামযা ভেঙ্গে পড়েছিল। বারবার তার বাবার কাছে বলতো- আবুল বারা ভাইয়ের কথা। হামযার বাবা তখন আমার কাছে এসে ছিলেন, তার দু গাল বেয়ে ঝরতে দেখেছি ফোটা ফোটা অশ্রু। এবার হামযা শহীদ হবার পর তার বাবাকে আরেকবার দেখলাম। কাঁদছেন, দু চোখে নেমেছে অশ্রু ঢল। কিন্তু হামযার বাবা আর দশ-বিশটি বাবার মত নন। তিনি নিজেকে ও পরিবারকে সান্তনাও দিয়েছিলেন। গভীর রাতে আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন। হে আল্লাহ! ছেলে হারানোর ব্যথায় যদিও আমি কাঁদি, কিন্তু আপনার ফায়সালায় আমি অতি সন্তুষ্ট মাবুদ। হে দয়াময় ! আমি তো তোমার কাছে এমনই চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে দান করবে একজন প্রকৃত হামযা। যার জীবন হবে সেই হামযার (রাঃ) মত, যার শাহাদাতও হবে সেই হামযার মত। আমি যা চেয়েছি তাই তো হয়েছে, তুমি তাই দিয়েছ আমায়। হে আল্লাহ! পিতৃত্বের দূর্বলতায় আমি না কেঁদে পারছি না। তুমি আমার কান্নার অপরাধ ক্ষমা করো। আমার গর্বের ধন হামযাকে আমাদের নাজাতের উসিলা বানাও।

****

জীবদ্দশায় হামযার সাথে কিছু স্মৃতি।

অনেকদিন আগে আবুল বারা ভাইয়ার জীবদ্দশায় হামযা আমাদের দু জনকে দাওয়াত করেছিল তার বাড়ীতে যাবার জন্য। আজ কাল করে আর যাওয়া হয়নি। আবুল বারা ভাই শহীদ হয়ে গেলেন। এরপরও হামযা কয়েকবার বলেছিল। কিন্তু আবুল বারা ভাই কে হারিয়ে মনটা ভেঙ্গেঁ যায়। তাই যাই যাই করে আর যাওয়া হয়নি। এক সময় হামযা ও শহীদ হয়ে যায়। আখন আমি নিঃসঙ্গ, একা। ভাবি এখনো যদি পূরণ না করি হামযার সাথে কৃত ওয়াদাটা, তাহলে সাক্ষাতে যখন হামযা প্রশ্ন করে বসবে তখন কি জবাব দেবো। তাই একাই রওয়ানা দেই হামযাদের বাড়ীর দিকে। প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন তো এমন পরিস্থিতিতে আপনার মনের অবস্থা কেমন হতে পারতো। হ্যাঁ এমন সব ঘটনা আরদ্বে শামের নিত্য দিনের ব্যাপার।

হামযার শাহাদাতের ২ দিন আগে, তার সাথে মসজিদে সাক্ষাৎ। তাকে সালাম দিলাম। তার হাত ধরে আছে এলাকার একটি ছোট্ট শিশু। আমি আদর করে তাকে চুমু খেলাম। তার শাহাদাতের পর আবার সেই শিশুটিকে দেখলাম, মন মরা হয়ে বসে আছে, পথের ধারে। আমি আবারো তাকে চুমু খেলাম অশ্রু ভেজা চোখ নিয়ে। হামযার সেই ছোট্ট বন্ধুগুলো। যাদেরকে নিয়ে সে নামাজ পড়তে আসতো। নামাজের পর হালাকা বানিয়ে কোরআন শিখাতো। আমি তাদের প্রত্যেককে দেখেছি বিষন্ন চেহারায়। তাদের প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে, আদুরে উস্তাদ কে হারিয়ে। আমি শিশুদের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তারা বলছে- যারা আমাদের প্রিয় বন্ধুকে হত্যা করেছে আমরা তাদের প্রতিজন থেকে প্রতিশোধ নেবো। শাহাদাতের পূর্বে হামযা তার এক আত্মীয়ের ব্যাপারে জানতে পারল সে নামাজে অলসতা করে। সংশোধনের জন্য তার কাছে উস্তাদ খালেদ আর রাশীদের "আহওয়ালুল আবেদীন" বয়ানটি পাঠাল। ইবাদতের উৎসাহ যোগানোর ক্ষেত্রে বড়ই মর্মস্পর্শী বয়ান। এরপর হামযা নিজেকে লক্ষ করে বলল, তুমি আরেক জনকে নামাজের উপদেশ দাও অথচ তুমি কিয়ামুল লাইলের ক্ষেত্রে কত অলসতা করো। এরপর থেকে সে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে বড় যত্নবান ছিল। আমি হামযাদের বাড়ী থেকে বের হয়ে আসলাম, এক সাগর ব্যথা বুকে ধারণ করে। বন্ধুদের বিচ্ছেদে আহত-রক্তাক্ত অন্তর সাথে নিয়ে।

হামযাদের এলাকায় এক বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হল। হাজ আলী নাম। ৮০ এর কোঠায় পা রেখেছে কয়েক বছর আগে। বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছেন। হামযার সাথে আমার সম্পর্ক জানতে পেরে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলেন। অঝোর কান্না। বললেন, সে মানুষ ছিল না। একজন ফিরিস্তা ছিল। প্রতি নামাজের সময় আমাকে সালাম দিত।

হামযার শাহাদাতের ২য় দিন সকাল বেলা। আমি শহীদ আবুল বারা ভাইয়ার রচিত নাশিদ শুনছিলাম। মেং (منغ meng) এর শুহাদাদের নিয়ে রচিত হৃদয় স্পর্শী নাশিদ। সেই নাশিদের একটি পংক্তি আমকে খুব নাড়া দিল। যার ভাবার্থ এই- কত শহীদ এমন আছেন যার শাহাদাতে উম্মাহ এতই উপকৃত হয়েছে যে যদি সহস্র বছরও তিনি বেঁচে থাকতেন এর সিকি ভাগ কল্যাণও উম্মাহ পেতনা। আমি হামযার জীবন নিয়ে ভাবলাম, দেখলাম, সে একজন তালিবুল ইলম। মুজাহিদ। নিয়মিত মুসল্লি। তার জীবনের ইতি হয়েছে পবিত্র শাহাদাত দিয়ে। তার জীবন নিয়ে আমার বড় ইর্ষা হল। আমি মনে মনে বললাম এদের গৌরবমাখা জীবনী দিয়েই রচিত হবে উম্মাহর ইতিহাস।

হামযা বিদায় নিল। চোখ ভরে দেখার পূর্বেই সে চলে গেল। আমাদের অন্তরে রেখে গেল আকাশ সম ভালোবাসা। সে চলে গেল, কাঁদাল মা-বাবাকে বন্ধুদেরকে, শিশুদেরকে, বৃদ্ধদেরকে, এমনকি নীড়ের অভ্যন্তরে পাখিরাও কাঁদলো তার বিয়োগে। জান্নাতের দুয়ারে দুয়ারে সাজ সাজ রব, সবুজ পাখিদের অভ্যর্থনার জন্য। শামের মেহেদী রাঙ্গানো পথঘাট-পান্তর। বীর শহীদানের মিছিল স্রোতে ধন্য। জিহাদের বাজারে লেগেছে আজ ভীড়, জান্নাত ক্রয়ের জন্য। তারাই বুদ্ধিমান যারা জান-মাল সঁপে দিয়ে এই অভিনব কারবারে লাভবান হচ্ছে।

খতিব সাহেব জুমার খোতবায় হামযার আলোচনা করলেন। তার জীবনের উজ্জ্বল কীর্তিগুলো তুলে ধরলেন। অবশেষে তার শাহাদাতের কথাও বললেন। খতিব শাহেব নিজেও কাঁদলেন, উপস্থিত সকলকে কাঁদালেন। হামযার জীবনী শুনে অনেক লোকের একটি ভুল ভাংলো। অনেকের ধারণা ছিল জিহাদের কষ্টসংকুল পথ, ঝুকিপূর্ণ জীবন এটা তো অসহায় অবহেলিত সমাজের জন্য। ধনীর দুলাল যারা, অভিজাত শ্রেণীর আদুরে সন্তান যারা, তাদের জন্য এই পথ নয়। কিন্তু হামযার জীবনকথা প্রমাণ করলো এই উম্মাহ জিহাদের পথে শুধু আদুরে সন্তান নয় জীবনের সব কিছুই কুরবান করতে পারে। তাদের মাঝে জাগ্রত হয়েছে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার অপার্থিব শক্তি। আমি অনেক যুবককে দেখেছি, হামযার শাহাদাতের খবর শুনে তাদের জীবনে আমুল পরিবর্তন এসেছে। খালেদ, সাদ, আব্দুল হাদী, মুহাম্মাদ আরো অনেক যুবক যাদের চাল চলনে ত্রুটি ছিল; অগোছালো জীবন ছিল। তারা সবাই তাওবা করে নেক জীবন ধারণ করে। জিহাদের কাজে মনযোগী হয়।

তুমি কি রেখে গেলে হামযা? এই আমুল পরিবর্তনের রহস্য কোথায়? জ্ঞানীজনরা বলেন ,শহীদদের রক্ত কারো জন্য অগ্নী, কারো জন্য নূর-আলো। আমি মাঝে মাঝী অনুভব করি হামযার ছায়া মুর্তিটি বাতাসের সাথে মিশে আমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করছে। আমার অন্তরস্থ তন্ত্রি সমুহে শুরের তরঙ্গ সৃষ্টি করছে ... নিশ্চয় শহীদদের সান্নিধ্যহীন জীবন বড়ই দুঃসহ ছন্দহীন।

তারাই জীবিতদের মাঝে সান্নিধ্যহীন নব জীবনের সুচনা ঘটায়। প্রিয় পাঠক হামযার জীবনী লেখা শেষ। আমি বলতে পারিনা তার জিবনী লেখতে গিয়ে আমার চোখের পানি বেশি ঝরেছে না কলমের কালি বেশি ঝরেছে। তবে চোখের পানি আর কলমের কালি উভয়টাই আমি সঞ্চিত রাখছি, আরশের ব্যাংকে। তুমি সাক্ষী থেকো আমার এ সঞ্চয়ের পক্ষে। হে উম্মাহর যুবকরা! এই দেখ আমাদের ইতিহাস। খালেদ (রাঃ) এর যোগ্য উত্তরসুরী বারা (রাঃ) এর পদাংক অনুসারীদের দিয়ে ভরপুর। সুতরাং মনোবল হারানোর কোন কারণ নেই। হামযার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তার শাহাদাত থেকে শক্তি অর্জন করো। মনে রেখো, হাজার মার্টিন সহস্র ম্যান্ডেলার ঘটনা এর সামনে কিছুই নয়। শান্তি বর্ষিত হোক তোমার উপর হে হামযা! কত বরকতময় তুমি। যে দিন আগমন করেছ তুমি এই ইহধামে। যে দিন বিদায় নিয়েছ এই ধরাধাম থেকে। যে দিন তোমাকে উঠানো হবে আরশপতির সামনে। রক্তমাখা দেহে। শান্তি বর্ষিত হোক তোমার রূহের উপর। তোমার স্থান হোক চির সৌভাগ্যবানদের কাতারে।

আবুল মুছান্না
১৫/ রবিউল আউয়াল
১৪৩৫ হিঃ